শিয়ালদায় ঢাকার নবাব বাড়িতে গান্ধী বসেছেন অনশনে। দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলকাতা। গান্ধীজি জ্যোতি বসুদের বলেছিলেন অবস্থা স্বাভাবিক করতে তোমরা মিছিল বের করো। মহম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে ট্রাম কোম্পানির হিন্দু মুসলমান সব শ্রমিকরাই মিছিল করায় সুফল পাওয়া গিয়েছিল কিনা ইতিহাস তার সাক্ষী।

কলকাতায় দাঙ্গা বিরোধিতা

সুবর্ণ হাজরা
(লেখক, সমাজকর্মী)

'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-সারা পৃথিবীতে কুখ্যাত এই শব্দগুলির উৎস ১৯৪৬ সালে কোলকাতায় হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানকে আর মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুকে লড়িয়ে দেওয়া দাঙ্গা। আগুন ধোঁয়াচ্ছিলই, তা জিভ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলিম লীগের ডাকা 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' কে উপলক্ষ করে।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরুতেই এর প্রেক্ষিতের সূত্রপাত। প্রথমে হিন্দু মহাসভা আর তার পরপরই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ডাক দিল মুসলমানমুক্ত নিজ বাসভূমির যা প্রকৃতপক্ষে ভারত বিভাজনের ডাক। মজার ব্যাপার হলো ভারততো বিভাজিত হলো কিন্তু ঐ দুই সংগঠনের যে দুই জায়গার সম্মেলন থেকে (লাহোর আর করাচি) দাবী উঠেছিল সেই দুই জায়গাই চলে গেল ভারতবর্ষের বাইরে। হিন্দু

হল্যান্ডের নদী বিজ্ঞানী জেনেসেন-এর নেতৃত্বে সুন্দরবনের মুখে সমুদ্রকে আটকাবার পরিকল্পনা হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। সেই নেডকো প্ল্যান বিধান রায়ের কাছে জমা পড়েছিল। অতঃপর শুধুই বিপদ আর জিজ্ঞাসা

কলকাতার গায়ে বাঘ-বন

তুষার কাঞ্জিলাল

(একদা বাংলায় বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের কর্মী। পান্নালাল দাশগুপ্তর প্রেরণায় সুন্দরবনে টেগোর সোসাইটি গড়ে তোলেন। সেখানকার মানুষকে নতুন জীবনের আলো দেখিয়েছেন)

সুন্দরবনের জন্যে নাকি পাঁচ হাজার কোটি টাকা আসার কথা আর তার মধ্যে পাঁচশো কোটি এসেও গিয়েছে। সাগর আর হিঙ্গলগঞ্জে কিছু কিছু কাজকর্ম শুরুও হয়েছে। এই টাকার সবটা ঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে সুন্দরবনের দুঃখ অনেকখানিই দূর হতে পারে। এই বাবদ আমার অনেকবারের বলে যাওয়া কথাগুলিই আবারও একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা জরুরি মনে করছি।

পটপ্রেক্ষা :

সুন্দরবনের বেশির ভাগটাই বাংলাদেশে, এক তৃতীয়াংশের মতো ভারতে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মোট ১০২টি লোনা জলের নদী দিয়ে ঘেরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সমষ্টি হচ্ছে ভারতের সুন্দরবন। মূলত এ বনের ভুবনজোড়া খ্যাতি মানুষখেকো রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চারণভূমি হিসেবে।

অনেকের কাছেই এ তথ্য অজানা যে, সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টিতে এখন আর বন নেই। দেড় শতাব্দী ধরে মানুষ সেখানে বন কেটে বসত গড়ে তুলেছেন। প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ লক্ষ মানুষ এমন দ্বীপগুলিতে বাস করেন যেখানে সুন্দরবনের বন ছাড়া আর সব মৌলিক বৈশিষ্ট্যই বর্তমান আছে। বাকি অংশের সঙ্গে মূল ভূকণ্ডের একটা নিবিড় যোগ তৈরি হয়েছে এবং প্রায় সকল অর্থেই সেগুলি মূল ভূখণ্ডের অংশ।

এই ৫৪টি দ্বীপকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ৩৫০০ কিলোমিটার নদী-বাঁধ। প্রশ্ন উঠতে পারে যে নদীগুলোকে বাঁধার প্রয়োজন হল কেন? সুন্দরবন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় প্রকৃতিসৃষ্ট একটি দ্বীপ—পৃথিবীর সব থেকে বড় ব-দ্বীপ, যার মূল তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। এক, এখানকার বন, বাদা-জঙ্গল। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ম্যানগ্রোভ গাছের বন। দুই, দ্বীপগুলিকে ঘিরে যে নদীগুলি আছে তার প্রত্যেকটিতেই জোয়ারভাটা খেলে। এবং তিন, এ বন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাসভূমি। সুন্দরবনের কিছু বড় বড় নদী এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ছোট ছোট নদী ও খাঁড়ি মিলে একটা নদী-শৃঙ্খল গড়ে উঠেছে। পলি বয়ে এনে প্রকৃতি এই দ্বীপগুলিকে সৃষ্টি করেছে। মূল গোলমালটা শুরু হয়েছে মনুষ্যবসতি শুরু হবার দিন থেকে। পলি জমে যতটা উঁচু হলে মনুষ্য বসতি গড়ে ওঠা উচিত ছিল তার অনেক আগেই অনাবাসী জমিদার, ভূমি-কাঙাল মানুষ এবং বিদেশি শাসকদের আগ্রহে মানুষ এখানে বসবাস শুরু করেছিল। নদীকে বাঁধার প্রয়োজন সে কারণেই মূলত সৃষ্টি হয়েছে।

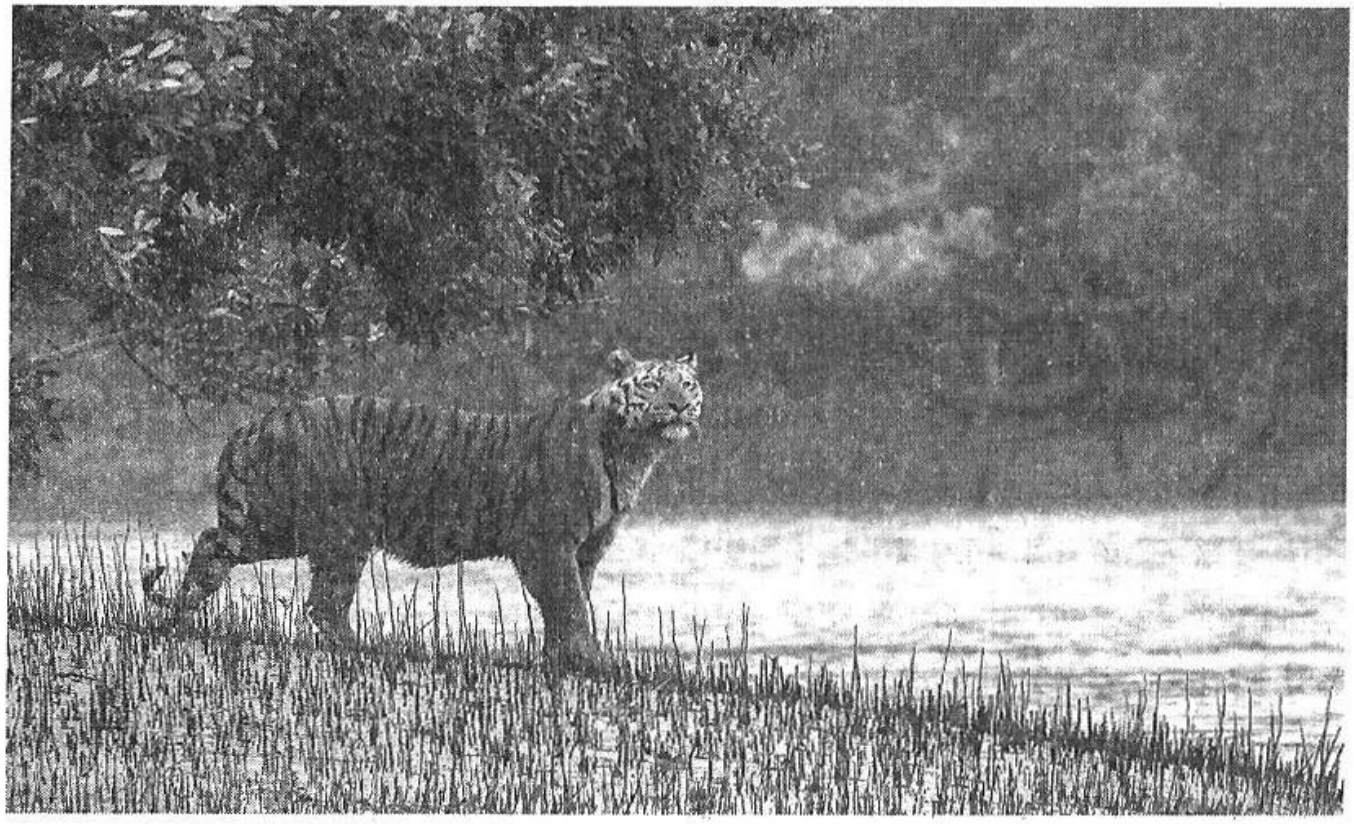

সুন্দরবনে বাঘ ও মানুষ সহবাস করে। অস্তিত্বের সংকট উভয়েরই

সমুদ্রে এবং তার সঙ্গে যুক্ত সুন্দরবনের নদী-খাঁড়িগুলিতে চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার জোয়ার ভাটা খেলে। জোয়ারে ছ'ঘণ্টা ধরে প্রচুর পরিমাণ জল নদীগুলি দিয়ে ঢোকে এবং নদীর জলের উচ্চতা ১৫ থেকে ১৮ ফুট পর্যন্ত বেড়ে যায়। জোয়ারে পুরো ভরনার সময় নদীর জল যতটা উঁচুতে থাকে, নদী-ঘেরা দ্বীপের মধ্যকার জমির উচ্চতা থাকে তার চেয়ে কম। স্বাভাবিক নিয়মেই কোনও বাধা না পেলে নদীর জল দ্বীপকে চব্বিশ ঘণ্টায় দু-বার ভাসিয়ে দিতে পারে। সেটা হতে দিলে দ্বীপে মনুষ্যবসতি গড়ে ওঠা, চাষবাস কিছুই সম্ভব নয়। সে কারণেই বসত গড়ার পূর্বশর্ত ছিল দ্বীপকে উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলা। যাতে নদীর জল দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়ে লোনা জলের প্লাবন না ঘটাতে পারে।

আগে যা হয়েছে

বাঁধ তৈরি করার কাজটা করেছিলেন অনাবাসী জমিদাররা এবং কোনও ধরনের বিজ্ঞান বা প্রকৌশলের সাহায্য তাঁরা সেক্ষেত্রে নেননি। এই ৩৫০০ কিলোমিটার বাঁধে প্রায় সবটাই মাটি বাঁধ। তাই নদী বাঁধে ভাঙন ঘটনা প্রায় তার জন্মকাল থেকে শুরু। ইদানিং এ ভাঙন যত্রতত্র যে কোনও সময় ঘটতে শুরু করেছে। ভাঙনের অনিবার্য ফল বিপর্যয় এবং অসংখ্য মানুষের ঘরবাড়ি, মাঠের ফসল, রাস্তাঘাট, গরু-ছাগল থেকে পুকুরের মাছ পর্যন্ত ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাওয়া। কয়েক দশক আগেও প্রধানত ঝড়-ঝঞ্ঝা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়েই নদী-বাঁধের ভাঙনের সমস্যাটা বড় আকারে দেখা দিত। এখন এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরবনবাসী এর ফলে চরম বিপর্যস্ত এবং চরম আতঙ্কের শিকার। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় যে সম্পদ তিলে তিলে তাঁরা গড়ে তোলেন এক ঘণ্টায় তা পুরো ধ্বংস হয়ে গিয়ে তাঁদের পথের ভিখিরি করে দিতে পারে। হালফিল সেটাই প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান হারে ঘটে চলেছে।

কেন এই বাঁধ

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার যে সুন্দরবনের দ্বীপগুলিকে বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলতে হয়েছিল কেন? সুন্দরবনের দ্বীপগুলি সৃষ্টি করেছিল প্রকৃতি। বঙ্গোপসাগর থেকে কিছু বড় এবং ছোট নদী দিয়ে প্রতি ৬ ঘণ্টায় একবার জোয়ারের প্রচুর জল সমুদ্র এই নদীগুলিতে ঢোকায় আবার ৬ ঘণ্টা ভাটায় সে জলের অনেকটাই সমুদ্রে ফিরে যায়। এই জোয়ারের ভরণার সময়ে জলের উচ্চতা প্রায় ২০ ফিটের মত বেড়ে যায়। প্রকৃতি মানুষের বাস করার জন্য এই দ্বীপগুলি গড়েনি। ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ এবং বাঘ বা আরও কিছু বন্য প্রাণীর বাসস্থান হিসাবেই এগুলি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৮৫৬ সাল থেকে ব্রিটিশ শাসকরা এই দ্বীপগুলিকে অনাবাসী জমিদারদের লীজ দিতে

আরম্ভ করে এবং তারা এখানে প্রধানতঃ পূর্ব মেদিনীপুর, খুলনা, যশোর এসব অঞ্চল থেকে ভূমি-কাঙাল মানুষদের এনে বসত গড়তে শুরু করেন। এই কাজটা করার দুটি পূর্ব শর্ত ছিল—প্রথমটি, যেখানে মানুষের বসত গড়া হবে সেই দ্বীপের জঙ্গলকে নির্মূল করে দিতে হবে এবং মানুষের বাস ও চাষের উপযোগী করে তুলতে হবে। দ্বিতীয়টি, জোয়ারের ভরণার সময় নদীগুলির জলের উচ্চতা প্রায় ২০ ফিটের মতো বেড়ে যায়। কিন্তু সে সময় দ্বীপের উচ্চতা থাকে ১৬-১৭ ফিট। যার ফলে প্রতি ১২ ঘণ্টায় একবার করে এই বাড়তি জল দ্বীপগুলিতে নোনা জলের প্লাবন ঘটাত। তাতে দ্বীপগুলিতে মানুষের বাস অসম্ভব ছিল। তাই জমিদাররা ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে ওঁরাও, ভুমিজ, মুন্ডা এই ধরনের উপজাতির মানুষগুলিকে নিয়ে এসে দুটো কাজ করান, প্রথমটি হচ্ছে জঙ্গল হাঁসিল করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাটি দিয়ে জোয়ারে যতটা জল ওঠে তার একটু বেশি উচ্চতা পর্যন্ত বাঁধ দিয়ে দ্বীপকে ঘিরে ফেলা। প্রথমেই বলে রাখি যে, এই কাজটা করতে গিয়ে জমিদাররা কোন ধরনের বিজ্ঞান বা প্রকৌশলের সাহায্য নেননি। একটা সময়ে এই বাঁধগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায় সরকারি সেচ দপ্তরের হাতে আসে। বাঁধগুলির প্রায় দেড়শো বছর বয়স হয়ে গেছে এবং বয়সের ভারে নানা ধরনের প্রকৃতির আঘাতে তারা নুব্জ এবং জীর্ণ। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই দীর্ঘ সময়ে নদীবাঁধ সম্পর্কে কোনো বড় ধরনের সমীক্ষা বা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়নি। সুন্দরবনে পশ্চিমবঙ্গের অংশে ১৯টি ব্লকে যে ১০২টি দ্বীপ আছে তার মধ্যে ৫৪টিতে এভাবে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের বাস গড়ে উঠেছে এবং এই দ্বীপগুলিকে ঘিরে মোট নদীবাঁধের পরিমাণ ৩৫০০ কিলোমিটার।

বাঁধ ভেঙে যায় কেন

প্রশ্ন, এই নদীবাঁধ কেন ভাঙ্গন হয়? আমি দীর্ঘকাল ধরে এবং এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন কয়েকটি দেশ ঘুরে ও নিজের সুন্দরবন বাসের অভিজ্ঞতা থেকে দুটি কারণ খুঁজে পেয়েছি—নদীবাঁধ দুটি কারণে ভাঙে—প্রথমটি ঢেউয়ের ধাক্কায় এবং দ্বিতীয়টি স্রোতের কারণে। ঢেউয়ের ধাক্কায় যে ভাঙন সৃষ্টি হয় তা শতকরা ১৫ থেকে ২০ শতাংশের বেশি নয়; বাকি সবটাই ভাঙে স্রোতের কারণে। স্রোতের কারণে যে ভাঙন হয় সেটা ঘটে নদীর একেবারে তলায় আর তার প্রকাশ ঘটে উপরে। উপর থেকে নদীবাঁধটা ভেঙে যায়। খুব সংক্ষেপে স্রোতের কারণে ভাঙন ব্যাপারটা বুঝতে গেলে অনেক গভীরে যেতে হবে। সমুদ্র থেকে কিছু বড় বড় নদী সুন্দরবনের দিকে ঢুকেছে যেমন গুয়াসাবা, জানিরা, সপ্তমুখী এবং আরও কয়েকটি। এবং এই বড় বড় নদীগুলিকে ভিত্তি করে একেকটি নদীশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়েছে। এই নদীগুলির কাজ হচ্ছে জোয়ারের বিপুল পরিমাণ জল সুন্দরবনে ঢোকানো এবং ভাটায় সেই জলের অধিকাংশটাই

সমুদ্রে ফিরিয়ে দেওয়া। জল ঢোকার সময়ে প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের পলি বয়ে নিয়ে যায় এবং সেই পলি জমে জমে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সমুদ্র যখন নদীতে জল ঢোকায় সেটা ভেসে ভেসে ঢোকে না, তার এত তীব্র গতিবেগ থাকে যে নদীর তলায় সে একটা খাল করে ঢোকে আবার ভাটার সময় জল বার করার জন্য প্রকৃতি আর একটি খাল তৈরি করে। এখন কোনো কারণে যদি একটি বড় নদীর মুখে বা তার কিছুটা অংশে পলি জমে সাময়িক বাধার সৃষ্টি করে তাহলে সমুদ্র সেই নদীতে কম জল ঢোকায় এবং অন্য নদী দিয়ে বেশি পরিমাণে জল ঢোকাতে থাকে। এর ফলে দুটো জিনিস ঘটে প্রথমটি হচ্ছে, যে নদীতে কম জল ঢোকায় সেখানে যত চওড়া এবং গভীর খাল তৈরি হয়েছিল তার দরকার হয় না। এবং সেটা আস্তে আস্তে বুজতে থাকে। আর যে নদীতে জল বেশি পরিমাণে ঢোকায় সেখানে নদীকে খাল আরও গভীর অথবা প্রশস্ত করতে হয়। এই প্রশস্ত করতে গিয়ে সে নদীর নীচে ভাঙতে থাকে, ফলতঃ নদীবাঁধ ভেঙে পড়ে। এই ধরনের ভাঙন রোধের কোনো প্রকৌশল আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তৈরি হয়নি। এখানে একটাই পথ খোলা থাকে তা হচ্ছে নদীকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বাঁধকে পেছনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। যেটাকে স্থানীয় ভাষায় 'রিং বাঁধ' বলা হয়। নদীর যতবার খাল বাড়াবার জন্য জায়গার দরকার হবে ততবারই আপনাকে পেছনে সরে যেতে হবে—এটাকে বলা হয় 'বাইং টাইম অব নেচার'। দেখা যায় যে প্রকৃতি নিজেই একসময় নদীর গতিপথ পাল্টে দেয় এবং তখনই সে জায়গায় ভাঙনের সমস্যা মেটে কিন্তু অপর কোনো জায়গায় ভাঙন নতুন করে তৈরি হয়। এই ভাঙন রোধে দুটো পদ্ধতির কথা এখনও বলা হয়ে থাকে। প্রথমটি Open System, এবং দ্বিতীয়টি Closed System। Closed System হচ্ছে সমুদ্রের মুখে নদীগুলিতে বড় বড় করে ড্যাম তৈরি করে সমুদ্রের জল ঢোকা আটকে দিতে হবে। তা হলে নোনা জলের সমস্যাও মিটবে এবং ভাঙনও প্রতিরোধ হবে। যেমন ১৯৫৮ সালে হল্যান্ডের নদীবিজ্ঞানী প্রফেসর জেনেসেনের নেতৃত্বে এই পদ্ধতিতে সমুদ্রকে আটকাবার একটা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। তারা দীর্ঘ ২ বছর সমীক্ষার পর একটা পরিকল্পনা ডাঃ বিধান রায়ের কাছে জমা দিয়েছিলেন যেটাকে 'Nedko Plan' বলা হয়। প্রথম পর্বে গোটা সপ্তমুখী এসটিউয়্যারী ৭৫ কিলোমিটার বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা করা যায়নি এবং সে প্রস্তাবও এখন অতল সমুদ্রে। এই ধরনের ব্যবস্থায় দুটি সমস্যা আছে। প্রথমটি—এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গেলে প্রাথমিক স্তরে প্রচুর পরিমাণ টাকা ঢালতে হবে। আমাদের মতো গরিব দেশে যেটা প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয় ভয় হচ্ছে যে যদি সমুদ্র কখনো এই ব্যবস্থা ভেঙে দেয় তাহলে গোটা সুন্দরবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যেমন হল্যান্ড এই ধরনের পরপর তিনটি ডাইক বা ড্যাম তৈরি করে দেশটাকে সমুদ্র থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সেখানেও বিজ্ঞানীরা

মনে করেন যে প্রতি ২ হাজার বছরে একবার সমুদ্র এই ৩টি ডাইক বা ড্যামকে ধ্বংস করে দেশটাকে গিলে খেতে পারে।

দ্বিতীয় পথটির মূল কথা হচ্ছে, যে প্রকৃতির ইচ্ছাকে বোঝা এবং তার সঙ্গে সমঝোতা করে বাঁধ বাঁচাও। প্রকৃতির ইচ্ছা যদি জানতে হয় তাহলে সমুদ্রের মুখ থেকে নদীর শেষ পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে অনেক ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। নদীতে সমুদ্র থেকে কতটা গতিবেগে জল ঢুকছে, এবং সেই স্রোত কোথাও কোনো অস্বাভাবিক আচরণ করছে কিনা, কি কি ধরনের পলি সে বয়ে নিয়ে আসছে, তার কোনো পরিবর্তন ঘটছে কিনা। নদীর জোয়ার ভাটায় প্রতিনিয়ত দ্বীপগুলির ভৌগলিক আকৃতি পাল্টে যাচ্ছে এবং তার কি প্রতিক্রিয়া স্রোতে ঘটছে—এ ধরনের বহু তথ্য, এবং এই তথ্য সমৃদ্ধ একটি তথ্যাব্যাঙ্ক তৈরি করতে হবে এবং প্রতি মুহূর্তে তা সংযোজন করে যেতে হবে। এই তথ্যগুলির উপর নির্ভর করে একটা নদীবাঁধ সংরক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং সেটাকে সৎভাবে রূপায়ণ করতে হবে। এই কাজটা করতে গেলেও প্রচুর পরিমাণ টাকার দরকার হবে, কিন্তু আমি মনে করি যে এই ভাঙনের জন্য দায়ী সুন্দরবনবাসী নয়, গোটা ভূপ্রকৃতিতে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে চলেছে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব এর জন্য অনেকটা দায়ী। যেমন এখন বিশ্ব-উষ্ণায়ণের ফলে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জল বেড়ে যাচ্ছে তার ফলে নদীতে জল বাড়ছে। তার ফলে জোয়ারে বাঁধের উপর দিয়ে বাঁধ উপছে জল দ্বীপে ঢুকছে। আয়লাই শেষ ঝড় নয়, এবং আমার ধারণা যে ক্রমেই নদীতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং একটা কোনো সময় যদি যে ঝড়ের উপর ভর করতে পারে তাহলে আরও বৃহৎ বিপর্যয়কারী আয়লার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

অতঃপর টাকা খরচের সময় কেবল বর্তমান সমস্যা ভাবলেই চলবে না, ভবিষ্যৎটাকে মাথায় রাখা চাই।

(**সম্পাদকের কৈফিয়ত :** কলকাতা একদিন সুন্দরবনের পেটে ছিল। আজও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে কলকাতাকে আগলে রাখে সুন্দরবন। যেমন মা তার সন্তানকে আগলে রাখে। সেই জন্যই সুন্দরবনকে বাঁচানো দরকার। কলকাতা বিষয়ক একটি সংগ্রহে সুন্দরবন বিষয়ক লেখাটি তাই আবশ্যিক সংযোজন।)

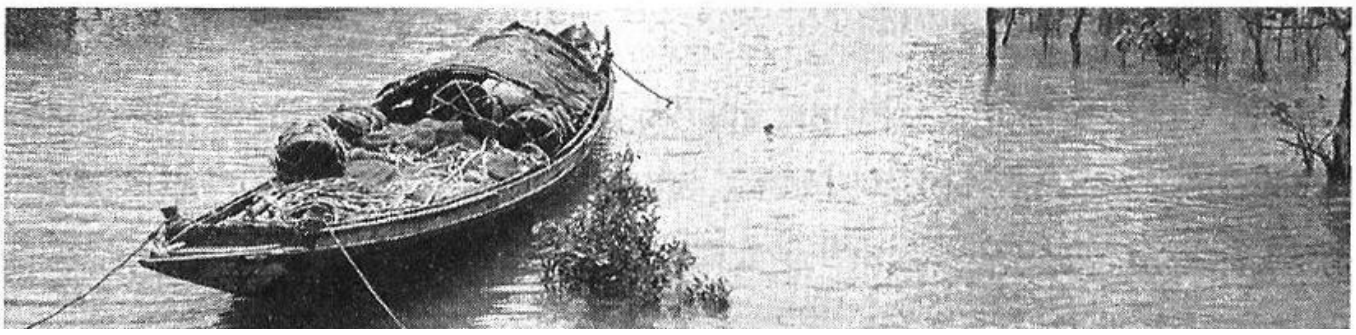

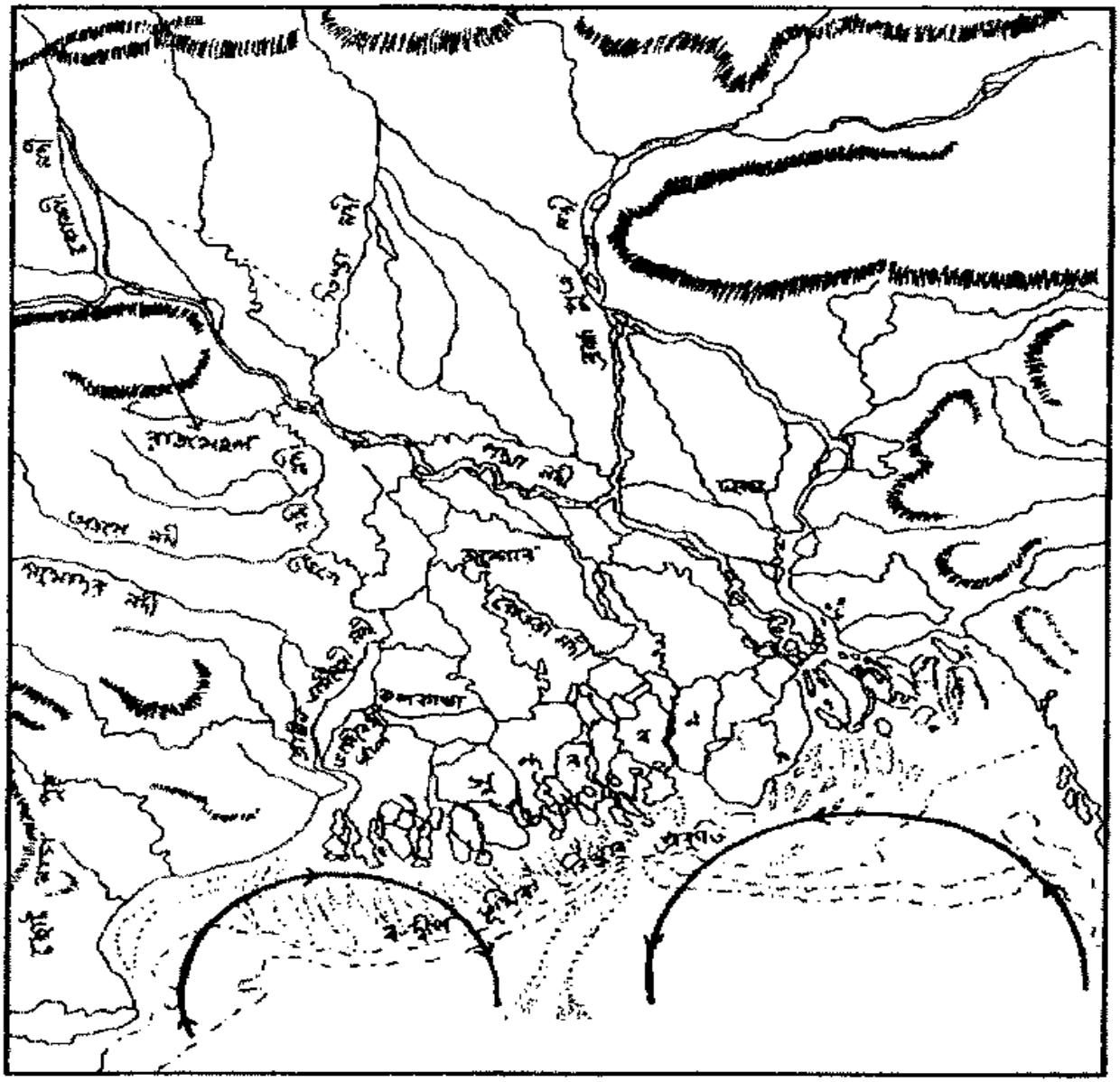

রেনেল - কৃত (১৭৬৪-৭৬) বাঙলার ভূমি ও নদনদী নকশা

নদীর সঙ্গে কলকাতার দেখাশোনা

ডঃ সুজীব কর

(শিক্ষাবিদ)

উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদ-নদী গুলি ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের দিক থেকে অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। বিজ্ঞানী প্যাস্‌কো ও পিলগ্রীম তাঁদের এই উত্তর ভারতের নদ-নদীর বিবর্তনের উল্লেখ করেছেন যে অতীতে ভারতের উত্তর প্রান্তে একটি অবিভক্ত জলধারা প্রবাহিত হত যার নাম হল ইন্দোব্রাম বা শিবালিক। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরণের ভূ-প্রাকৃতিক বিবর্তনে এই নদী তিনটি অংশে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ এই নদীর গতিপথে দুটি উল্লেখযোগ্য জলবিভাজিকার সৃষ্টি হয় (১,২)। এই বিভাজিকাগুলি হল উত্তর

পূর্বভারতে শিলং মালভূমি এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের পোর্টওয়ার মালভূমি বা দিল্লি শৈলশিরা। এই তিনটি খন্ডিত অংশের মধ্যে উত্তর পূর্ব ভারতের ব্রহ্মপুত্র বর্তমানেও তার আদি পথে প্রবাহিত। মধ্যভাগের বিচ্ছিন্ন অংশটি হিমালয় থেকে আগত উপনদীগুলির সাথে মিলিত হয়ে গঙ্গা নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। পশ্চিমপ্রান্তের অংশটি একই ভাবে হিমালয় থেকে আগত জলধারাগুলির সাথে মিলিত হয়ে সিন্ধু নাম ধারণ করে আরব সাগরে পতিত হয়েছে।

বঙ্গভূমির নদ-নদী বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তথ্য পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন মানচিত্র যেমন - ১০০ সালের কাছাকাছি টলেমি অঙ্কিত মানচিত্র, (৩,৪) ১৫৫০ সালে জাও দ্য ব্যারোস কৃত মানচিত্র, ১৬৬০ সালে ফন্ ডেন ব্রোক-কৃত মানচিত্র এবং ১৭৬৪ থেকে৭৬ সালে রেনেল - কৃত মানচিত্র যেমন বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে তেমনি ইবন-বতুতা (১৩২৮-১৩৫৪), বারনি (চতুর্দশ শতক), র‍্যালফ্ ফিচ (১৫৮৩-১৫৯১) প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের বিবরণ এবং বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চন্ডিমঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গোবিন্দ দাসের কড়চা, বিপ্র দাসের মনসামঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং সমসাময়িক বিভিন্ন মুসলীম লেখকদের বিবরণি বঙ্গভূমির নদ-নদীর বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করছে। এই সমস্ত বিবরণীগুলি বঙ্গভূমির নদ-নদীর প্রকৃতিগত পরিবর্তনকে যেমন নির্দেশ করে তেমনি সময় বিশেষে এই নদ-নদী গুলির বিস্তারগত প্রকৃতিকেও বিশেষভাবে নির্দেশ করে।

পূর্বতন বঙ্গভূমির যে সমস্ত নকসা পাওয়া যায় তাদের তুলনামূলক আলোচনা থেকে একথা সহজে বলা যায় যে বিভিন্ন সময়ে নদ-নদী গুলি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে।

ভৌগোলিক বিবর্তনের ইতিহাসে দক্ষিণবঙ্গ নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল নামে পরিচিত। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই সমগ্র ভূ-খন্ড বিন্যস্ত রয়েছে বঙ্গোপসাগরেরউপর অর্থাৎ আমরা ও আমাদের সুন্দরী কলকাতা সবই বঙ্গোপসাগরের উপর যুগ যুগ ধরে গঙ্গা নদী বাহিত পলিরাশির সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের উপর অবস্থান করছি। আজ থেকে প্রায় ৩০ কোটি বছর পূর্বে ছোটোনাগপুর মালভূমির প্রান্তে গঠিত হওয়া ডাউকি চ্যুতিরেখা বরাবর ভারতের উত্তর পূর্বদিকে শিলং মালভূমির স্থানান্তর। বঙ্গোপসাগরের এই অংশে (বেঙ্গল বেসিনের উপর) অধিক পরিমাণে পলিরাশির সঞ্চয় ঘটায়। যার প্রভাব স্বরূপ পরবর্তী কালে রাজমহল পাহাড়ের প্রান্তদেশে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে দ্রুত গতিতে পলিরাশি সঞ্চিত হতে থাকে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে গঙ্গার মূল প্রবাহ বারংবার শাখায়িত হতে থাকে এবং পলি সঞ্চয়ের মাত্রাগত আধিক্যের দরুন ব-দ্বীপ ভূমি দ্রুত প্রসারিত হয় এবং এই ভূমিভাগের উপর দিয়ে শাখানদী

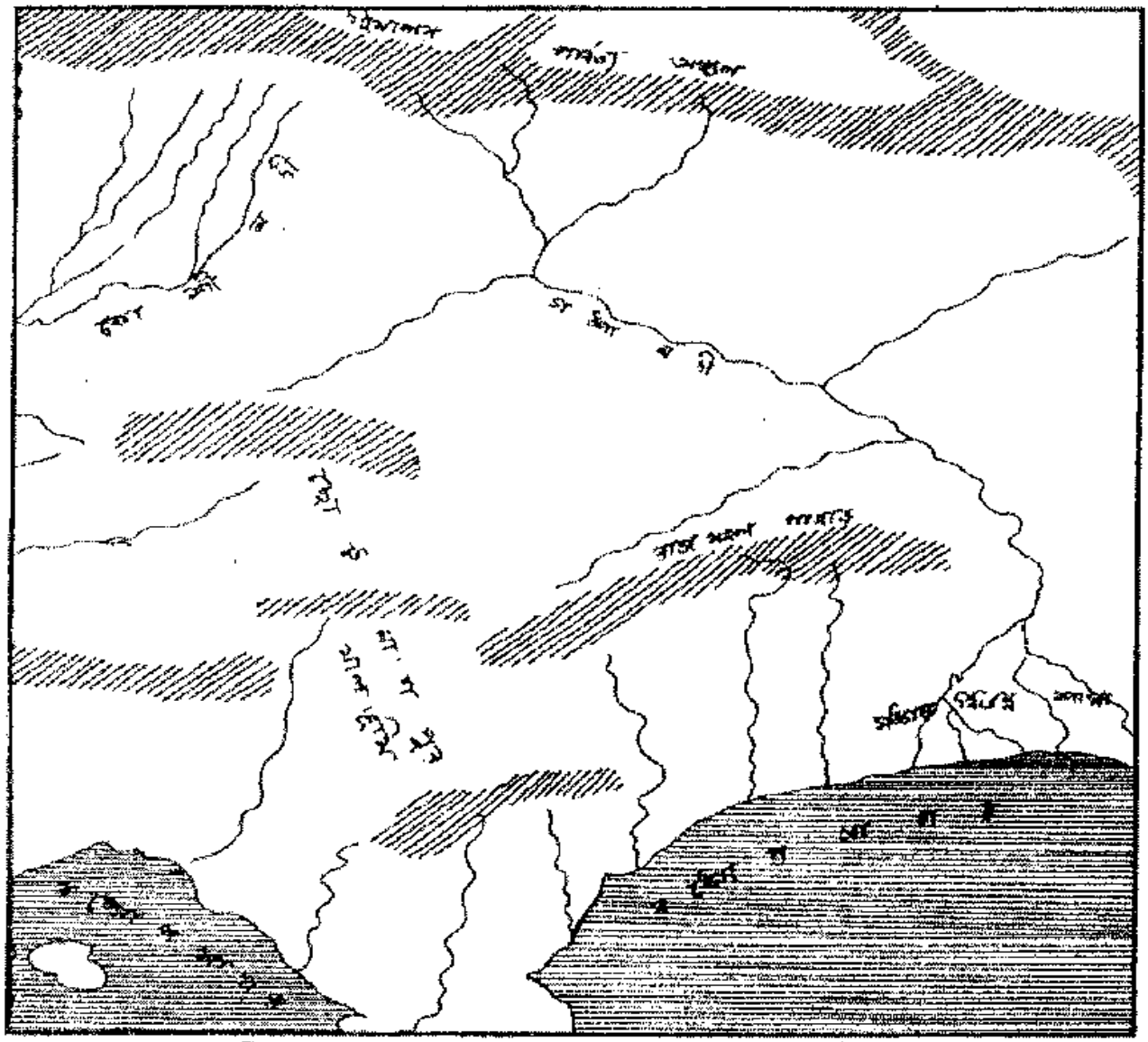

টলেমী (৯০-১৮০) বাঙলার ভূমি ও নদনদী নকশা

গুলিও দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। তাই বিভিন্ন সময়ে গঙ্গার প্রবাহপথে যে ভূ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে।

দার্শনিক ও বিজ্ঞানী টলেমির মানচিত্রে গঙ্গার তিনটি ক্ষীণ জলধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ১৫৫০ সালে ব্যারোসের মানচিত্রে গঙ্গার মূলপ্রবাহ রাজমহল পাহাড়ের পরবর্তি অংশে বিচ্ছিন্ন কতগুলি ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে যা সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। এই সমস্ত ব-দ্বীপের বেশ কিছু অংশ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত এবং বাকি অংশ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত অর্থাৎ সেই সময়ে এই মানচিত্র অনুযায়ী বঙ্গভূমি বিচ্ছিন্ন কতগুলি দ্বীপের সমষ্টি। এই পর্যায়ে বঙ্গোপসাগর অবস্থান করত একদিকে তাম্রলিপ্ত বন্দরের কাছাকাছি এবং অপরদিকে মালদহের কাছাকাছি স্থানে এবং এই অবস্থায় বঙ্গোপসাগরের জলধারার বিপরীতমুখী প্রবাহ গঙ্গার শাখারে দ্রুত বিভাজিত করতে থাকে। ১৮৬০ সালে ফন্ ডেন্ ব্রোকের মানচিত্রে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের মধ্য দিয়ে গঙ্গা তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে কিছু পথ

প্রবাহিত হবার পর পুনরায় সংযুক্ত হয়ে বিনুনীরূপী জলনির্গম সৃষ্টি করে সামান্য কিছু পথ প্রবাহিত হবার পর বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। পরবর্তি কালে আরো দেখা যায় সাগরসঙ্গমে উপনীত হবার পূর্বে এই জলধারা বারংবার শাখায়িত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে ব-দ্বীপ ভূমি বঙ্গোপসাগরের দিকে বিস্তার লাভ করেছে। এক্ষেত্রে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে উপস্থাপন করা যায় রেনেল কৃত মানচিত্র (১৭৬৪-১৭৭৬) উপস্থাপনার দ্বারা। এই মানচিত্র অনুযায়ী বাংলার ভূমি ও নদনদী নকশা দক্ষিণবঙ্গে জালিকাকারে বিন্যস্ত নদনদীর প্রকৃতিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে। এই মানচিত্র অনুযায়ী আরো বলা যায় দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয় ও সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীগুলি গঙ্গার মূলবিন্যাসের মধ্যে অবস্থান করলেও এদের প্রবাহ পথের প্রকৃতি থেকে বলা যায় এই নদীগুলি পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে ভাগীরথী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। কিন্তু আদিগঙ্গা ও প্রধান গঙ্গার প্রবাহ পথের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণভূমি গঙ্গার শাখানদীগুলির প্রবাহপথ এবং তাদের আভ্যন্তরীন সংযোগকে নির্দেশ করে। এই কারণে বর্তমানের আদি গঙ্গা দিয়ে আসা বাণিজ্যতরী বর্তমানের পদ্মা পর্যন্ত বিস্তীর্ণঅঞ্চলের জনগণকে বাণিজ্যের সুযোগ দান করতো। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের তথ্যসূত্র অনুসারে চাঁদসদাগর এই আদিগঙ্গার প্রবাহ পথেই বাণিজ্যতরী নিয়ে যেতেন তাছাড়া ওই সময়কার আরো তথ্যসূত্র থেকে যানা যায় এই সমস্ত শাখানদীগুলিদ্বারা কলকাতা থকে ঢাকা পর্যন্ত বাণিজ্যতরী যেতে সময় লাগতো দশ থেকে বারো ঘণ্টা তা ছাড়া বিপ্রদাসের এই বর্ণনায় আরো পাওয়া যায় চাঁদসদাগরের বাণিজ্যতরী প্রবাহ পথে রাজঘাট ও রামেশ্বর পার হয়ে যখন সাগরসঙ্গমে অগ্রসর হচ্ছে তখন পথে পড়েছে উজানি, অজয়নদী ও শীবানদী (বর্তমান শিয়ালনালা) এরপর ধীরে ধীরে যে সমস্ত স্থান গুলির নির্দেশ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাটোয়া, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, হুগলী, ভাটপাড়া, কাকিনাড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটি, রিষড়া, কোন্নগর, আড়িয়াদহ, চিতপুর, কলিকাতা, কালিঘাট, বারুইপুর, হাতিয়াগড়, চৌমুখি, সতমুখি এবং সবশেষে সাগরসঙ্গম। এর পরবর্তী ফন্ ডেন্ ব্রেক অবং ব্যেরোসের নকসায় আগোরপাড়া ও বরানগরের উল্লেখ পাওয়া যায় অর্থাৎ বিপ্রদাসের সময় থেকে (১৪৯৫) ১৬৬০ সালের মধ্যেই ভাগীরথীর গতীপথে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এর থেকে বলা যায় গঙ্গার এই গতি পথের পরিবর্তনে মূলজলধারা বারং বার শাখায়িত হওয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তিকালে দ্রুত পললায়নের ফলে গঙ্গার মুল প্রবাহ দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয়েছে। মজে গেছে বিভিন্ন ক্ষুদক্ষুদ্র জলধারা গুলি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরস্বতী। তাছাড়া গতিপথ থেকে বিচ্যুতি হয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আদিগঙ্গা। অতীতে এই পথেই ভাগীরথীর সমুদ্র যাত্রা ঘটত।

প্যালিওসিন যুগের পরবর্তী পললায়ণ

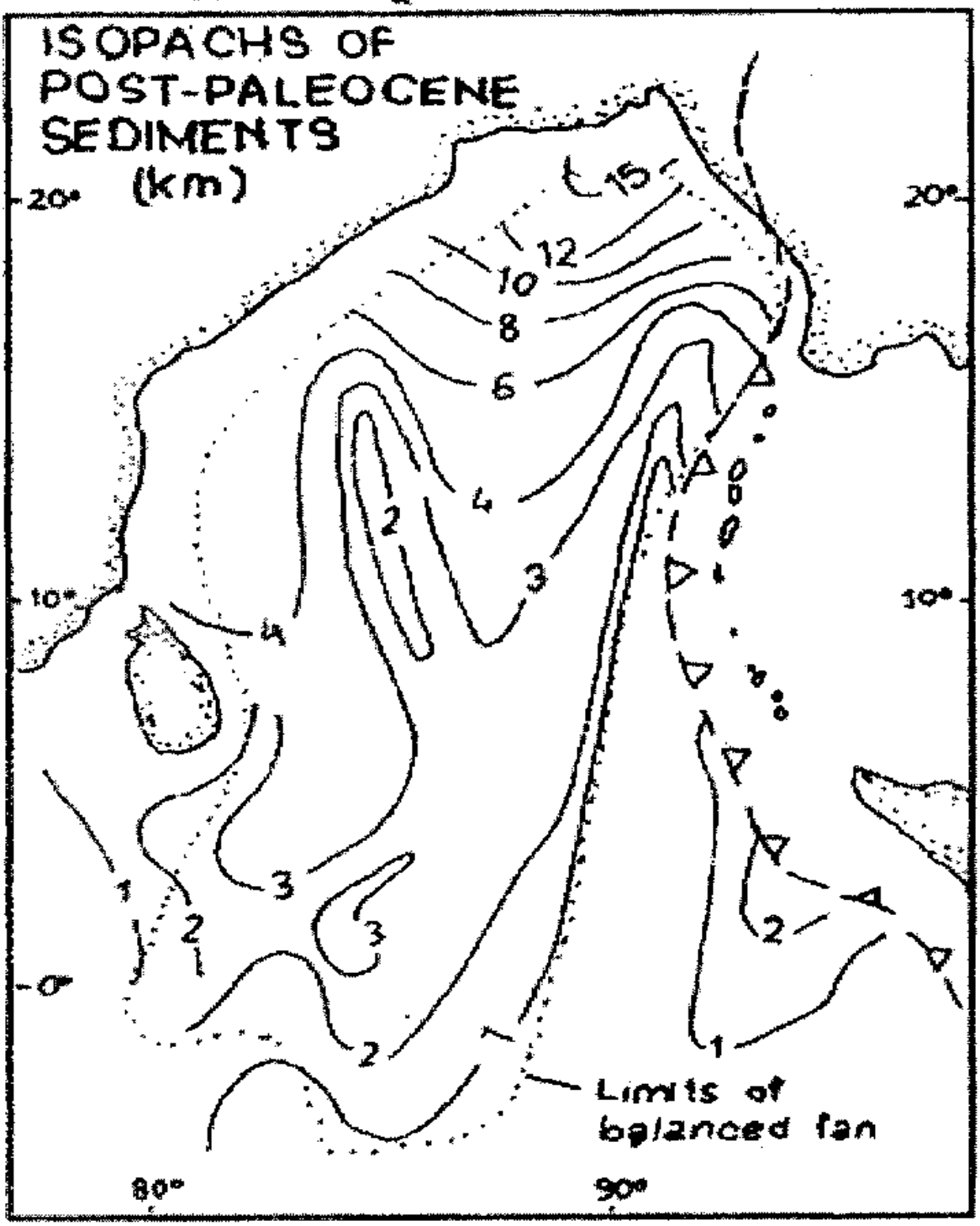

ভারসাম্যযুক্ত ফ্যানের সীমানা

দক্ষিণবঙ্গে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে যে গুলি ছোট নাগপুর মালভুমি থেকে উদ্ভুত হয় সেগুলি ছাড়া বাকি প্রত্যেকটি নদী ১৬৬০ সালে গঙ্গা ও পদ্মার শাখানদী হিসাবে এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলকাতার ভূমিরূপের আপেক্ষিক উচ্চতা গত যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তার থেকে বলা যায় শহরায়নের পূর্বে এই সমসত জলধারাগুলি প্রত্যেকটি এই তরঙ্গায়িত সমভূমির উপর প্রবাহিত হত এবং পরবর্তিকালে ইংরেজরা গঙ্গার মূলপ্রবাহকে ত্যাগ করে ভাগীরথী খালের দ্বারা হুগলী

নদীকে সংযুক্ত করার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণবঙ্গে প্রবাহিত জলধারা গুলি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। শাখানদী গুলিতে তাই মূলনদীর জলধারা আর প্রবাহিত হতে পারে না। তাই এই নদী গুলির শীর্ষদেশ ধীরে ধীরে পলিরাশির সঞ্চয়ে মজে যেতে থাকে। অপরদিকে ক্রমান্বয়ে ব-দ্বীপ ভূমির ক্রমঅগ্রসরতাএবং জোয়ারের জলধারার ভিন্নমুখি প্রবাহ এই নদীগুলির বৈচিত্রকে অনেকাংশে হ্রাস করে। জোয়ারের জলের ভিন্নমুখী প্রবাহে এই নদীগুলির শীর্ষদেশে আরো দ্রুত মজে যেতে থাকে। এর প্রভাব স্বরূপ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আরো দ্রুত ভূ-বৈচিত্র স্বাধিত হতে থাকে। ১৫৫২ থেকে ১৬৬০ এই দীর্ঘ সময়ে প্রাপ্ত মানচিত্রবলি পাঠ করলে দেখা যায় এই অঞ্চলে গভীর বাদাবন অবস্থান করতো এং ওই সময়ে কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে হোগলাগাছের জঙ্গল, গোলপাতার জঙ্গল এবং সুন্দরী গাছের অবস্থান দেখা যেত। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলীবর্দীর সময় কালে ভাগীরথী প্রবাহ পথ ধীরে ধীরে মজে যেতে থাকে যার ফলে ওই সময়ে ভাগীরথীর মূল প্রবাহ মজে যেতে থাকে এবং ভাগীরথী নদী সরস্বতী নদীর পরিত্যক্ত পথে প্রবাহিত হত এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরের কাছাকাছি গঙ্গা সাগরসঙ্গমে মিলিত হত। এই সমস্ত নদনদীর বর্ণনা আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এবং আবুলফজলের গ্রন্থেও বিশেষভাবে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে আরো উল্লেখ করা হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে এই অংশে একবারব্যাপক জলপ্লাবন ঘটে এবং তার প্রবাহে দক্ষিণবঙ্গের শেষপ্রান্তে গড়ে ওঠা বিপুল জনপথ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে আরো উল্লখ করা যেতে পারে ১৫৮৪ সালে ব্যাপক বন্যায় এই অঞ্চলের প্রায় ২ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটে এবং এই অঞ্চল জনমানব হীন হয়ে পড়ে। বর্তমানের পর্যালোচনায় মনে করা হয় ওই সময়ে এই অংশে প্রবল ভুকম্পন ঘটে যার ফলে সুনামি সংঘটিত হয়। এই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক প্রভাবে এই অঞ্চল জনমানবহীন হওয়ায় বিস্তীর্ণ বাদাবন সৃষ্টিহয় যা বর্তমানে সুন্দরবন নাম পরিচিত। এই বনভূমি মূলত কলকাতার দক্ষিণপ্রান্ত থেকে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে বিস্তার লাভ করে। তাই ওই সময়ে কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে হোগলাগাছের জঙ্গল, গোলপাতার জঙ্গল এবং সুন্দরীগাছের জঙ্গল দেখা যেত। কিছুদিন পূর্বে মেট্রোরেলের খননে সুন্দরী গাছের শ্বাসমূলের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে বিন্যস্ত মাতলা, হাড়িয়াভাঙ্গা ঠাকুরান ও সপ্তমুখি প্রভৃতি নদীগুলি প্রাথমিক ভাবে পদ্মার শাখানদী হিসাবে বিকাশ লাভ করে। এই সমস্ত নদীগুলিতে গঙ্গার মূল প্রবাহ বিশেষ আসতোনা। তাই জোয়ারের জলের ভিন্নমুখী প্রবাহে এদের শীর্ষদেশ মজে যেতে থাকে এবং এই সমস্ত নদীগুলি বর্তমানে জোয়ারের জলে পুষ্ট নদী বলে পরিগণিত হয়।

কলকাতা বন্দরের পত্তন এবং দ্রুত শহরায়ন এই সমস্ত নদীর গতিকে আরো সঙ্কীর্ণ করে তোলে তাই বঙ্গভূমির দক্ষিণের এই নব গঠিত ভূমির উপর জালের মতো

জাও দ্য ব্যারোস কৃত (১৫৫০) বাঙলার ভূমি ও নদনদী নকশা

বিস্তৃত নদীগুলির গতিপথ রুদ্ধ হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে শহরায়নের করালগ্রাসে কলকাতা ও তার পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল আবদ্ধ হয়।

বর্তমানে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত নদীগুলি রয়েছে তাদের ও শীর্ষদেশে বর্তমানে জোয়ারের জল পৌঁছাতে পারে না তাই এদের শীর্ষদেশ একদিকে মজে যাচ্ছে এবং ভিন্নদিকে উপূলরেখা দ্রুত প্রসারিত হওয়ায় এই নদীগুলির গভীরতা

হ্রাস পাচ্ছে এবং ব-দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে চলেছে। জনবসতির ক্ষেত্রে ক্রমবিস্তার একদিকে যেমন মানুষের চাহিদাকে মেটাচ্ছে তেমনি সুন্দরবনের ভারসাম্যকে নষ্ট করছে।

পূর্ববর্তী গঙ্গানদী সময়ের সাথে সাথে যেভাবে পরিবর্তিত হযেছে তারবেশকিছু অস্তিত্ব বর্তমানেও দেখা যায় করুনাময়ী-বেগড়খালে, আদিগঙ্গা-খিদিরপুরখালে, কেষ্টপুর-সল্টলেক-ইচ্ছামতীখালে, বাকজোলা-ভাঙর-খড়িবেড়িখালে এবং গঙ্গানগর-বারাসাত- ইচ্ছামতীখালে। বর্তমানে বিন্যস্ত এই খাল পথগুলিকে সংস্কার করে এবং পূর্ববর্তী প্রবাহিত নদীগুলির শাখায়িত বিন্যাসকে যদি সংযোগ করা যায় তা হলে এর মতো পরিবেশ বান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা আর কিছুই গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। পরিবহনের অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব কতটা তা বলা কঠিন কিন্তু বর্তমানে কলকাতার পরিমন্ডল পরিবেশদূষণের ভারে যেভাবে জর্জরিত সেক্ষেত্রে কলকাতাকে খুব সহজেই দূষণমুক্ত করা যাবে। কল্লোলিনী কলকাতা শব্দদূষণের ভারে আক্রান্ত হবে না, প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কার্বন-মোনোক্সাইডের হাত থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। সুলভে পরিবহন ও বাণিজ্য সম্পাদিত হবে। বর্তমানে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রির প্রচলিত দাম ১৫ থেকে ২০ শতাংশ হ্রাস পাবে।

নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অবশ্যই আকর্ষণীয় হওয়া উচিত কারণ কলকাতার মতো পৃথিবীর অন্যান্য মহানগরীতে এই ধরণের বিন্যস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। তাই কলকাতার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে সমগ্র পৃথিবীতে কলকাতা ও তার নগর পরিকল্পনা সর্বাপেক্ষা আধুনিকতম পরিবেশ বান্ধব নগরপরিকল্পনার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্থাপন করতে পারবে।

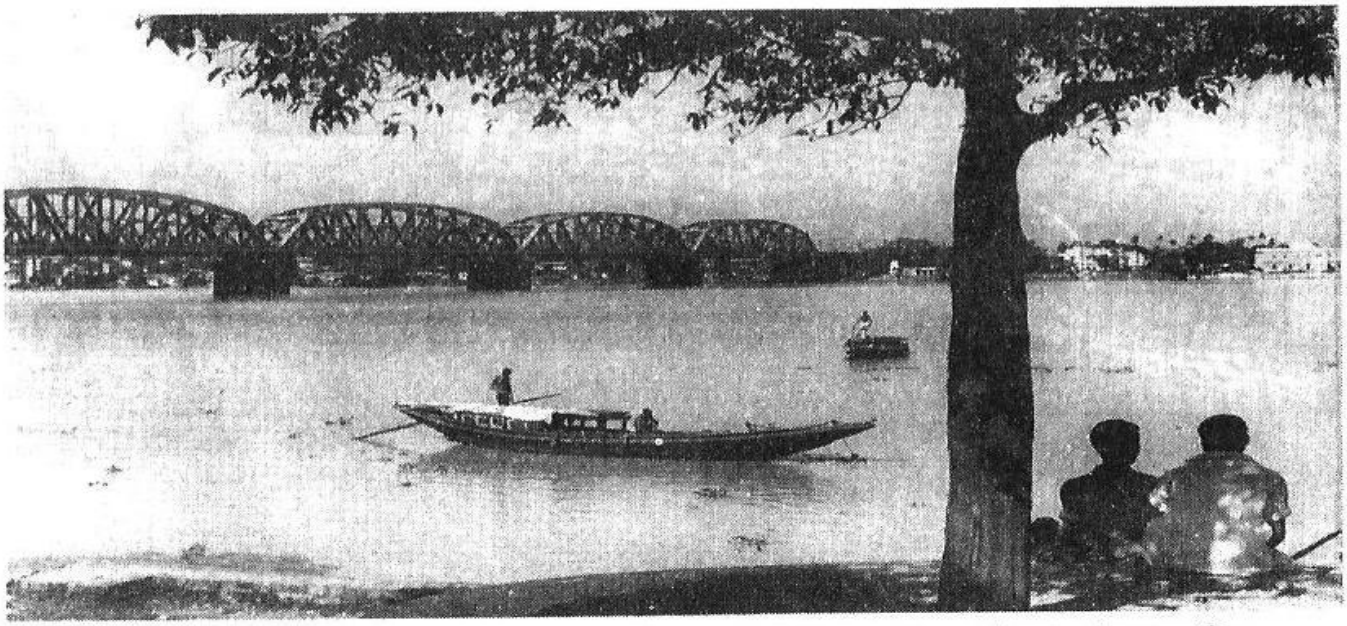

গঙ্গা বয়ে এনেছে কলকাতা নগর জীবনের নানা অনুষঙ্গ। এটা তারই একটি। সেদিনও ছিল। আজও আছে।—সেতুটি ওয়েলিংডন ব্রিজ আজকের বিবেকানন্দ সেতু।

চায়ের আপণ

প্রফুল্লকুমার দে
(শিক্ষাবিদ, সখের গবেষক)

সাধু-শয়তান দুঃখ-সুখ—কলকাতার সবকিছুতে চা না হলে চলে না

'চায়ের কাপে ঝড়' বাংলা বাগধারাটির উৎপত্তি বেশী দিনের নয়। অনুমেয় চা পান চালু হওয়ার পর ভাষায় এর প্রচলন। সাধারণের ধারণায় যেসব চিত্রকল্প ধরা দেয় এ বাগধারার ব্যঞ্জনায় তাও বেশ গোলমেলে। চায়ের কাপে ঝড় উঠবে কি করে? ঝড়ে তো চা চলকে পড়ে যাবে, চুমুক দেওয়া আর হয়ে উঠবে না। তবু ঝড় ওঠে কি করে, কোথায়? আসলে চা ভর্তি কাপ এখানে অনুঘটক, চা পানকারীরা ঠোঁটে চা ঠেকানোর পরই কথার ঝড় বইতে থাকে চায়ের টেবিল ঘিরে। চা উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য কোন বাস্তব বা কাল্পনিক বিষয়ে বিতর্ক। চা, Vocal Cord এর tonic। গলাবাজি, তর্ক পূজোর বাজনা।

চায়ের মত শক্তিদায়িনী পানীয়র পরিবহণ পরিবেশনের কৃতিত্ব কিন্তু ইংরেজের। দেশের অশনে বসনে ভূষণে নানা প্রকরণের প্রচলন শুরুর লক্ষ্যই ছিল বণিক বৃটিশ জাতির ব্যবসার বিস্তারণ। ভূগর্ভ, ভূতল, বায়ুমন্ডল থেকে পাওয়া প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে ব্যবসায় এরা ছিল সিদ্ধহস্ত। প্রকৃতিপ্রাপ্ত বস্তুই হয়েছে বাণিজ্যপণ্য। বঙ্গদেশের পেলব ভূমিতে চা গাছ ব্রাত্য। বঙ্গের উত্তরে, পূর্বহিমালয়ের উচ্চভূমি হল চা গাছের আবাসস্থল। দেশে চা পান চালু করতে চতুর ইংরাজকে চালাকি করতে হয়েছে। সে আমলে বিপণনে বিজ্ঞাপনের সাহায্য সহজ ছিল না। চা কোম্পানীর কর্মীরা ব্যস্ত বাজারের ধারে চা প্রস্তুত করে চা পানে আহ্বান জানাতো। সাহেবি কোম্পানীর তৈরী চা পানে পথচলতি আগ্রহী মানুষ হাতে গোনা যেত। অনেকেই ধারে কাছে আনাগোনা করে বিষতুল্য বিবেচনা করে সরে পড়ত। রাতে রেলগাড়ির কামরায় বিনিপয়সায় চা বিতরণের ব্যবস্থা থাকত। চায়ের নিদ্রানাশকারী গুণ যাচাইয়ের এমন ব্যবস্থা সত্যিই

চমকপ্রদ। বাজারের কিনারা আর রেলগাড়ির কামরা থেকে চা কে বনেদি বাড়ির বৈঠকখানায় পৌঁছতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ক্রমে চায়ের প্রতি বিরাগ কেটে গিয়ে বাড়ল অনুরাগ, শুধু কি তাই, সোহাগের চা চলে এলো অন্তঃপুরে সকালের শয্যায়। সেকালে বিত্তবানদের বৈঠকখানার আড্ডায় চায়ের আসন পাকা হয়ে গেল। বুদ্ধিজীবীদের বসার ঘরে চা ছাড়া আলোচনাতো পেট্রোলশূন্য মোটর গাড়ি। বাঙালির মজলিস আড্ডা আগেই ছিল, চায়ের আগমনে বন্ধন বৃদ্ধি পেল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে চায়ের আসর বেশ বিস্তারলাভ করল, বিশেষভাবে আদি কোলকাতার বসতিপূর্ণ অঞ্চলে। বড়লোক বাড়ীর বাইরের ঘর চায়ের মজলিসে থাকত সরগরম। সেখানে আমজনতার আনাগোনা ছিল না। বৈঠকখানার জানলা গলে চায়ের সৌরভ পাড়ার নিম্নবিত্তদের নাকে পৌঁছল। বাড়ীতে আলাদা বসার ঘর নেই অথচ চা পানের চাহিদা আছে এ অভাবপূরণে অলিগলিতে এসে গেল জয়দুর্গা কেবিন, বিশুর চা, নেপুর চা, ব্রাইট টি স্টল নামধারী তৈরী চায়ের সরবরাহকারীরা। চায়ের সঙ্গে টা নিয়ে বসার টেবিল চেয়ার, কোথাও দোকানঘরের দেওয়ালে কাঠের পাটাতন লাগিয়ে চায়ের কাপ রাখার ব্যবস্থা, বসার জন্য লম্বা বেঞ্চ এই হল চা দোকানগুলোর সাধারণ কাঠামো। বাঙালির পেটে চা সহনীয় ও গ্রহণীয় হওয়ায় চা হল জনপ্রিয়। চা পানের অভ্যাসকে চায়ের নেশা বলতে দ্বিধা থাকল না, ফারাক শুধু নেশার মৌতাত আছে চায়ের তা নেই, জলতেষ্টার মত চা-তেষ্টা পেতে পারে যখন তখন যত্রতত্র। গৃহকর্তার আপিস যাওয়ার তাড়া সকাল সকাল বাজার যেতে হবে, যাওয়ার আগে এককাপ ধোঁয়া ওঠা চা না হলে চলে না, উপায় নেই, গিন্নী চান ঘরে, রান্নাঘরে রাঁধুনি গুষ্টিবর্গের রান্নার তোড়জোড়ে ব্যস্ত - চল গলির মুখে মোহনের চায়ের দোকান। গতরাতে মধুদার সঙ্গে বৌদির সিনেমা যাওয়া নিয়ে মন কষাকষির জের সকাল পর্যন্ত গড়িয়েছে, চা জোটেনি, অগত্যা মোহনের চা। সিধুর রেশন তোলার দিন, ভোর থেকে লাইনে দাঁড়াতে হবে, চা নাহলে দাঁড়ান যায় না সহায় চা-দোকান। খুব ভোরে মোহন কয়লার উনুন জ্বেলে পেল্লাই সাইজের কেটলির পেটে জল ভরে ফোটানোর জন্য চাপিয়ে দেয়, কেটলির মুখে বাস্পের ফোঁস ফোঁসানির সঙ্গে চলে চা চালান। চায়ের যোগান দিতে দিতে সময় গড়িয়ে যায় বেলা একটায়।

গলির মুখ থেকে চলন শুরু করে বড় রাস্তার মোড়, রাজপথ, হাটবাজার, কলেজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের আশেপাশে আস্তানা গাড়ল চায়ের দোকান। পাড়া, অঞ্চল, পরিবেশ অনুযায়ী পদবি নানারকম স্টল, কেবিন, রেস্তোরা, কাফে, কাফেটেরিয়া কখনো শুধুই নাম। জাত, গোত্র, বর্ণও হল অনেকরকমের, রুচি, অর্থ, মর্যাদা, আভিজাত্য ও বৃত্তি অনুসারে চা-আপণ স্বাতন্ত্র বজায় রেখে মহানগরের সর্বত্র বিরাজমান হল। কাকভোরে চায়ের জলগরমের আগেই চা-পায়ীর আগমন, গরম চা সরবরাহের

চুমুকে চমক চায়ের অন্য জগৎ

পরই আসর সরগরম। ভাজাভুজি, কেক, বিস্কুট সহযোগে চা পানের সঙ্গেই চলে, কূটকচালি, পরনিন্দা, পরচর্চা, খেলা, রাজনীতি, আলোচনা তর্কাতর্কি।

মহাকবি কালিদাসের কালে চায়ের আবির্ভাব হলে এর সৌরভ স্বাদে, রসেগুণে বিভোর হয়ে কবি এ গুল্ম পত্রকে শত বিশেষণে বিভূষিত করতেন- এমন অনুমান বিশেষ দোষের হবে না। একালের কবিরাও একে নামাবলী পরালেন না। চা- একক, একমেবাদ্বিতীয়ম। চা বিপণের নামের বিচিত্র বাহার শব্দানু-সন্ধানীর চিন্তার ইন্ধন। ঘরোয়া সাধারণ নামের বহু দোকানের ভিড়ে কয়েকটি বিরল নামাঙ্কিত চায়ের দোকানও চোখে পড়ে। ছেলেবেলায় চোখে পড়া এমন এক নাম 'ভবানী আশ্রম' চায়ের দোকানের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম। যে পাড়ায় বাস ছিল সেই গলির মুখ থেকে বড় রাস্তার চায়ের দোকান, পাশের পথের বিপরীতে ছিল স্বনাম খ্যাত হরিশ মুখার্জীর বাস্তুভিটে (বর্তমান বহুতলের পদতলে)। স্কুল যাওয়া পথে তাঁর স্মৃতিফলক পাঠ ও চায়ের দোকানের সাইনবোর্ডে চোখ বুলানো অভ্যাস ছিল। কিশোর মনে প্রশ্ন জাগত সামান্য চায়ের দোকান, তাহলে আশ্রম কেন? ভবানীপুর বা ভবানী নামের ব্যক্তি থেকে 'ভবানী' হওয়ার হক থাকতে পারে কিন্তু আহাম্মকের মত 'আশ্রম' কোথা থেকে? দাদাদের কাছে নাম রহস্য উন্মোচনের আবেদন জানালে বলে, 'চায়ের দোকানে চা খাই আড্ডার সময় কাটাই নাম নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কই?' বয়ঃজ্যেষ্ঠরাও খোলসা করে তেমন কিছু বলে না। অর্থ বুঝতে সমর্থ হ'লাম বেশ কিছুদিন পরে। বড় হয়েছি, প্রতিবেশীদের অনেকের সঙ্গেই আত্মীয়তার ভাব। একদিন, বোধহয় ছুটির দিন, দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠেছি এমন সময় পাশের বাড়ির গোপালদার বৌ ডেকে বললেন, 'খোকন, তোর দাদা সেই সক্কালে বেরিয়েছে, এখন এতবেলা

হ'য়ে গেল ঘরে ফেরার নামটি নেই। যা তো ভাই, একবারটি ডেকে নিয়ে আয়।' বলি- 'দাদাকে এখন কোথায় পাব? বৌদি বলেন- 'ওমা, ওই একটাই তো ঠাঁই নেওয়ার জায়গা, ঐ 'ভবানী আশ্রম' চায়ের দোকান। যা যা আর দেরী করিস না, গিয়ে বল বৌদি না খেয়ে বসে আছে।' জামা পরে ছুটলাম। বেলা হয়েছে, দোকানে ভিড় নেই, দু একজন চা-পিপাসু বেঞ্চে বসে আছে, দাদা একটা খালি বেঞ্চে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টানছেন, একহাতে ধরা খবরের কাগজ। আমায়ে দেখে অবাক, বললেন- 'তুই এতবেলায়, এখানে?' বৌদির বার্তা নিবেদন করলাম। বেশ গম্ভীর বললেন 'হুঁ, বল গে যা আমি কয়েক কাপ চা, পাউরুটি টোস্ট আর ডবল ডিমের ওমলেট খেয়ে বেশ আছি। সময় হলে যাব। কি সব নিরিমিষ্যি রান্না করেছে তাই খেয়ে নিতে বল। যা, বেলা হয়েছে দেরি করিস নে।' ফিরে বৌদিকে সব জানালাম। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বললেন- 'বুঝেছি এখনও ওনার রাগ পড়েনি। ঠিক আছে, এক মাঘে শীত যায় না, আসুক বোঝাপড়া হবে, তখন।' অনুমান করলাম সকালে কোনকিছু নিয়ে কথা কাটাকাটির পর মন কষাকষি। বলি- 'বৌদি, বুঝেছি দাদার কোনকিছু নিয়ে রাগ অভিমান হয়েছে। যদি কিছু মনে না কর তাহলে আমায় বলতে পার। আমায় বলে ফেললে তোমার মনের ভার কিছুটা কমবে।' বৌদির বিবৃতি থেকে জানা গেল যে আগের দিন রাতে বৌদি বারবার জানান দিয়ে রেখেছিলেন, পরের দিন 'গাড়ু সংক্রান্তি' দাদা যেন মাছ মাংস কিছু না আনেন। সকালে বাজারে গিয়ে ঝকঝকে সোনালি ইলিশের আমদানি দেখে দাদা স্মৃতিভ্রষ্ট হন ও একটা দেড় সেরি ইলিশ আর আনুষঙ্গিক নিয়ে বাড়ী ফেরার পর তুলকালাম। দাদা দ্বিতীয় রাউন্ডের চা না খেয়েই 'ভবানী আশ্রম' এ হাজির। সমাজে, সংসারে মনঃকষ্টে পীড়িত, মর্মাহত বিপর্যস্তদের আশ্রয় আশ্রম। দিনের কয়েকঘণ্টা হলেও পাড়া প্রতিবেশীদের মনঃকষ্ট লাঘবের আশ্রয় তাই 'ভবানী আশ্রম'।

বয়স বাড়ল, চারণক্ষেত্রের সীমানাও ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গীসাথীদের নিয়ে দক্ষিণে হাজরা মোড় অবধি মাঝেমাঝে চক্কর দেওয়া শুরু। চায়ের দোকানের ছোটোখাটো Hub সে আমলেও ছিল। হাজরা পার্কের (যতীন দাস পার্ক) পূর্বে পুরাতন বাড়ীর একতলার লম্বাটে ঘরে রেস্টুরেন্ট (রেস্তোরাঁ), নাম 'Cafe '। কাল অনুযায়ী বেশ আধুনিক নাম। চা-রসিকদের রসনাতৃপ্তির জন্য পাওয়া যেত মোগলাই পরোটা, মাংসের চপ, ডিমের ডেভিল আর দুধরণের কাটলেট। এর কাটলেটের সুনাম আজও আছে। ছুটির দিন সকালে চা কফির আড্ডায় কাফে থাকত জমজমাট। শুনতাম চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন সহযোগীদের নিয়ে কাপের পর কাপ চা পান করে আসর জমাতেন। কাফের মুখরোচক ভোজ্যই খদ্দের টানত, বাইরের বাহার জৌলুষ তেমন ছিল না। কাফের কপাল মন্দ তার মুখ ঢেকেছে মেট্রো স্টেশন, নতুন খদ্দেরের খোঁজ পাওয়া

শক্ত। রাস্তা পেরিয়ে মোড়ের দক্ষিম পশ্চিম কোণে বিরাট বাড়ীর নীচে পাশাপাশি দুটি চায়ের দোকান, ঘর ছোট, বসার জায়গা কম তবু খদ্দেরের খামতি নেই। পশ্চিমদিকে হাজরা রোড ধরে এগোলেই সাঙ্গুভ্যালি রেস্টুরেন্ট। যে আমলে চা পান জনপ্রিয়তার তুঙ্গে সে সময়ে চা-রসিকদের কাছে নামটি ছিল অতি পরিচিত। কোলকাতা মহানগর জুড়ে সাঙ্গুভ্যালির ছড়াছড়ি দেখে মনে হত এরা একই ব্যবসা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। দক্ষিণে পায়ে পায়ে এগোলেই 'বসুশ্রী' সিনেমা হল—উপরে কফি হাউস, বহর, চেহারা, সাজসজ্জায় এ আলাদা। বড় জানালা, আলোকিত প্রশস্ত হলঘর, আরামদায়ক বসার আসন সাধারণ নয় অভিজাত। চা বা কফি নিয়ে আসনে আসীন যারা তাদের চেহারা, উজ্জ্বল মুখ, পোশাক পরিচ্ছদে পরিচয় পাওয়া যায় এর স্তর। লেখক, বুদ্ধিজীবীদের আলাপে মুখর হলঘর। আলাপ প্রিয় অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জিকে ঘিরে ছুটির দিনে কফি সিগারেটের ধূমে আসর থাকত জমে।

চা-প্রেমিকদের পছন্দের চায়ের প্রতি আসক্তির পশ্চাৎপট অনায়াস দৃশ্য নয়। তার প্রসার রসনার স্বাদ অনুভূতি থেকে প্রাণের বাসনার সীমানা পেরিয়ে মানস অন্তঃপুরে। ঈপ্সিত চায়ের অনুষঙ্গ অনেক, প্রস্তুতি-প্রকরণ, পরবেশ ও পরিবেশন এমনকি প্রস্তুতকারক বা কারিণীও গণ্য। চায়ের প্রতি উদ্ভিন্ন ভালবাসা, চা পানের অমোঘ টান পরিবেশনকারীর জাত কুলশীল মান মানে না। আলোকমালায় অলংকৃত, আরামকেদারা ও মসৃণ সানমাইকা শোভিত রেস্তোঁরার চায়ে তৃপ্তি না পেয়ে পুরাতন বাড়ীর নীচে চুনকাম খসা ঘরের চা-দোকানে চা-পিয়াসীদের চা পান করতে প্রায়ই দেখা যায়।

আমার প্রিয় চাপৃক্ত অধ্যাপকের সৌজন্যে এক নিরলংকার, স্বল্পোজ্জ্বল, অল্প পরিসর অধিকারী চা-দোকানের সঙ্গে পরিচিত হই। দোকানের সামনের অবয়ব, উপবেশনের আসন, অন্যান্য উপকরণ বিশেষণহীন। ঘরের মস্তকাবরণ টালির। বাহিরের রূপহীন এমন দোকানে চা-রসিকরা আসে কোন টানে, এ রহস্যের উদ্ঘাটন হল চা পানে। দোকানঘরের অন্তরে নিরন্তর চা প্রস্তুত করে চলেছে নিষ্ঠাবান কর্মীগণ। পিরিচ আসীন চা-পূর্ণ পেয়ালা পৌঁছে যাচ্ছে দোকানের সম্মুখে, দুই পার্শ্বে অপেক্ষমান আসক্তদের কাছে। চা পান কালে অধ্যাপক ইতিহাসসহ দোকানের গুণাবলীর বিবরণ দিলেন। স্বাস্থ্য সচেতন স্বত্ত্বাধিকারীর নির্দেশে পানাহারের পর সকল পেয়ালা পিরিচ চামচ ফুটন্ত জলে ফেলে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এ ব্যবস্থা অতিরিক্ত ক্রেতা আগমনের অন্যতম কারণ। লেকমার্কেটের পাশে, জনক রোডে অবস্থিত রাধুবাবুর চায়ের দোকান তরুণ বয়েসেই আকর্ষণ করেছিল। চা ছাড়াও রূচিদায়ক সুস্বাদু চিকেন স্টু, রোস্ট, ফিসচপ, ফিসফিংগার, ব্রেস্ট কাটলেট ও ফিস ফ্রাই সবই উপাদেয়। সিনেমা তারকা, অভিনেতা, চিত্র পরিচালকদের নিয়মিত আগমন হত এখানে। আপন মোটরযানে বসে তাদের চা পান দৃশ্য কৌতূহল জাগাত উপস্থিত চা-পানকারীদের মনে। সমপেশার

লোকজন, একই অফিসের কর্মীগণ, শিক্ষকগণ, পৃথকভাবে জোটবদ্ধ অবস্থানে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চা-পানে রত- এই চিত্র পথিকদের নজরে পড়ে নিত্য। পুরাতনের গায়ে রটনার রঙ লাগানোই রীতি- কথিত যে স্বদেশীযুগে এই নিরাভরণ অতিসাধারণ চা-কেন্দ্র ছিল বিপ্লবীদের সাময়িক বিশ্রামের স্থল। 'রাধুর চা' আজও চা অভিলাষীদের অতিপ্রিয়, দোকানঘরের বৃদ্ধি হয়নি কিন্তু ক্রমবর্ধমান চা-পিয়াসীদের সমাবেশ দোকানের বিপরীতে রোয়াক পর্যন্ত পৌঁছায়। অধুনালুপ্ত এক রেস্তোঁরার নাম স্মৃতিপথে আগত। তার অস্তিত্ব স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাসবিহারীর মোড়ের উত্তর পূর্ব কোণে 'অমৃতলাল' রেস্তোঁরার চায়ের সুখ্যাতি ছিল। সুবিন্যস্ত টি স্টলটির সজ্জিত অন্দরমহলে একটা অভিজাত ভাব ছিল। সুপের চায়ে চুমুক দিতে দিতে তৎকালীন খ্যাতনামা কবিদের কয়েকজন আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। স্বল্পখ্যাত চলচিত্র শিল্পীরাও অবসর সময় অতিবাহিত করতেন।

শৃঙ্খল-সুত্রে বিপণনে সাঙ্গুভ্যালির রেস্তোঁরাগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলে কোলকাতার চা কৃষ্টির ইতিকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শহরের নানাস্থানে স্থিত হয়ে চা ও চা অনুষঙ্গ ভোজ্য পরিবেশনে সুনাম অর্জন নাম শব্দানুসন্ধানীর চিন্তার কারণ হতে পারে। ব্যবসার অধিকারীরা চট্টগ্রামের সমনামের উপত্যকার অধিবাসী। বিপণির সাইনবোর্ডে আদি জন্মভূমির স্মৃতিলেখা। চট্টগ্রামবাসীদের সুনাম ছিল রসনাতৃপ্তিদায়ী রন্ধনে, রেস্তোঁরাগুলি ছিল সচল। কালের গতিতে অনেকগুলি গতয়ু, কয়েকটি আজও টিকে আছে। ভবানীপুরে পূর্ণ সিনেমার নিকটে সাঙ্গুভ্যালি স্বচ্ছন্দে বিদ্যমান।

বিগত খ্যাতি 'বসন্ত কেবিন' নামের রেস্তোঁরার কয়েকটি এখনও মহানগরের বুকে জেগে আছে। পূর্ণ সিনেমা হলের উপরতলের বৃহৎ বসন্তকেবিন বহুদিন অচল। কলেজস্ট্রীটে, মেডিকাল কলেজের বিপরীতদিকে অবস্থিত বসন্ত কেবিন ক্রেতা অল্পতায় আক্রান্ত। নাতি দীর্ঘ দোকান ঘরে নিত্য চা পানে আসা খদ্দের হাতে গোনা যায়। জানি না, ক্লিষ্ট কেবিন থাকবে আর কতদিন।

চা কফিতে দেশী বিদেশী বিভেদরেখা বিলীন হয়নি। কফিতে পাশ্চাত্যের আবহের আভাস, চায়ে প্রাচ্যের সহজ সরল আবেশ। ঈষৎ উচ্চ সোপানে কফির অধিষ্ঠান, সমতলে সাধারণের চলে চা পান। মাটির ভাঁড়ে ভরপুর গরম চা মন কাড়ে অনেকের, চিনামাটির মসৃণ উজ্জ্বল কাপ ছাড়া কফি এক প্রকার অচল। যত্রতত্র কফিসপ, কফিবার মেলাভার, চা সর্বত্রগামী। কফির স্বাতন্ত্র্যের জন্য এর বিপণনে স্থান নির্বাচন অগ্রগণ্য। মধ্য কোলকাতার চিত্তরঞ্জন এভিনিউর বিরাট কর্মস্থলে অবস্থিত যুগ্ম কফি হাউস উল্লেখযোগ্য। অফিসপাড়ার কেতাদুরস্ত বাবু, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী শিল্পীদের সমাগমে কফি হাউস দুটি মুখর ছিল। সিনেমা শিল্পী ও কলাকুশলীদের আনাগোনা ছিল

নিয়মিত। ঐন্দ্রজালিক পি. সি. সরকার জুনিয়র মহাজাতি সদনে ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের পূর্বে কিয়ৎক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে কফিপানে মিলিত হতেন।

কলেজস্ট্রীটের কফি হাউসের কৌলিন্যের কালানুক্রমিক ধারাবাহিক বিবরণ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কোলকাতার বিদগ্ধজনের বিচরণ ক্ষেত্রে বিরাজমান কফিহাউস স্বনামে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় আবিষ্ট বিশিষ্টগুণীজনের সমাবেশে আকীর্ণ এর হলঘর কোন কোন সময়ে রত্নগর্ভ হ'য়ে উঠেছে। চা-ঘেঁষা কথাবার্তা কফির স্পর্শে তিক্ত না করে চায়ের অনুগমন করাই শ্রেয়।

পথ চলায় উত্তরায়ণ হয়েছে - মহাত্মাগান্ধী রোড ও কলেজস্ট্রীটের সংযোগ স্থলের কাছেই প্রাচীনত্বের ছাপালাগা 'দিলখুশা কেবিন' বইপাড়ায় ঘোরা ফেরা করা ক্লান্ত পুস্তক প্রেমিকদের সেবায় নিযুক্ত বহুদিন। একদা ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের chamber ছিল এখানে। উত্তর কলকাতার চায়ের দোকানগুলিতে প্রবেশ করে রচনার বিস্তার পাঠককে ক্লান্ত করবে। আপাততঃ আলোচনার সংকোচন শ্রেয়। চয়িত চা-পান কেন্দ্রের দু একটির কথা না বলে স্বস্তি নেই। অগ্রজ প্রতিম প্রয়াত প্রধান শিক্ষক মদনমোহন রায়ের সঙ্গে গল্প ও আলাপের মাঝে প্রায়ই শ্যামবাজারের কাছাকাছি চট্টগ্রামবাসী পরিচালিত এক রেস্তোঁরার প্রসঙ্গ উঠত। রন্ধনশিল্পী পরিচালকের নিজ রেসিপিতে তৈরী 'প্যানথেরাস' খেয়ে আশ মিটত না। শখেও কোন কোন ভোজনরসিক চা কফির বিপণি উন্মোচন করেছেন। শুনেছি বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় এক সময় রেস্তোঁরা খোলায় উদ্যোগী ছিলেন। বিপণির বিচিত্র নামাবলীর মধ্যে স্মরণীয় নাম 'যোজন গন্ধা' অতীতে হাজরা মোড়ে কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। ভবানীপুরে ভারতী সিনেমার পাশে, আলোকিত, কল্লোলিত রাজপথের ধারে রেস্তোঁরা 'বনফুল', নামকরণে নিজস্বতা স্পষ্ট। ঈষৎ চরিত্র পরিবর্তন করে আজও সচল।

যন্ত্রগণক নির্ভর ও তাড়িত যান্ত্রিকজীবনে চায়ের কাপ সহকারে অবসর বিনোদন বাস্তব বুদ্ধিভ্রংশের লক্ষণ। চায়ের চল কমেনি, চা পানের ভঙ্গিমা বদলেছে। পূর্বের নাসিকা জিহ্বার তৃপ্তিসাধন করতে করতে চা পানের পরিবর্তে আপন গৃহকোণে চায়ের গলাঃধকরণ ও পর্যায়ক্রমে ব্যস্তজীবনে অবগাহন হল আধুনিকতা। গত শতকের মধ্যভাগে লেখক কবিদের গৃহে আড্ডা মজলিসে চায়ের সৌরভে আমোদিত সাহিত্যিকদের রসালোচনার চিত্র বর্তমানে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। সাহিত্য রচনা ক্রিয়ায় চা উৎসেচক রূপে কাজ করে কিনা জানা নেই। সে যুগে চায়ের দোকানে রেস্তোঁরায় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সাহিত্য, সিনেমা, সংবাদ খেলাধূলা নিয়ে আলোচনা তর্কের ঝড় বইত। হাল আমলে বাহারি আলোর মোড়কে অলংকৃত সুসজ্জিত রেস্তোঁরা, কফিবারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে সচেতন চা-পানকারীরা সাহিত্য রাজনীতির আলোচনা করলেও সরবে নিজমত প্রকাশে বিরত থাকে, কথা হয় স্বল্পশব্দে মৃদুভাষে, চায়ের কাপে ঝড় স্তিমিত।